অধ্যায় ৭

আবহাওয়া ও জলবায়ু

অধ্যায় ৭ আবহাওয়া ও জলবায়ু

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ুচাপ, বাতাসে আর্দ্রতা ইত্যাদির ভিত্তিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- ☑ গ্রিনহাউজ গ্যাস ও গ্রিনহাউজ ইফেক্ট: কারণ ও প্রতিকার
- ☑ অ্যাসিড বৃষ্টি
- ☑ ওজোনস্তর ক্ষয়
- ☑ জলবায়ুর উপর মানবসৃষ্ট প্রভাব

৭.১ আবহাওয়া ও জলবায়ু

শীতকালে স্কুল আগে ছুটি হয়ে গেলে তোমরা নিশ্চয়ই কখনো না কখনো দুপুরে বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে গল্পের বই পড়েছ। বিছানার পাশে জানালা থাকলে দুপুরে প্রতিদিন জানালা দিয়ে বিছানায় রোদ পড়তে দেখবে। শীতের দুপুরে দেখবে সূর্যের আলো ও তাপ (যাকে আমরা এক সাথে রোদ হিসেবে জানি) বিছানায় সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। আবার গরমের সময় দেখবে একই সময়ে সূর্যের আলো বিছানার উপর অনেক কম জায়গা নিয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, সূর্যের আলোর দিকও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। গ্রীষ্মকালে বিছানার ওপরে সূর্যের আলো যতটা খাড়াভাবে পড়ে, শীতকালে তার চাইতে অনেক বাঁকা বা তীর্যকভাবে পড়ে। আবার শীতকালে বিছানার বেশি অংশ জুড়ে সূর্যের আলো পড়লেও গরম সময়ের তুলনায় অনেক কম তাপ পাওয়া যায়।

তেমনি গ্রীষ্ম বা বর্ষায় যেদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হয় তার কিছু সময় (কয়েক ঘন্টা বা দিন) আগে থেকে ভ্যাপসা গরম লাগে। এই সকল ঘটনা ঘটে আবহাওয়ার নানান পরিবর্তনের জন্য।

৭.১.১ আবহাওয়া

আবহাওয়া ও জলবায়ু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত দুটি শব্দ। প্রতিদিন টেলিভিশনের খবরে একটা অংশ থাকে আবহাওয়ার প্রতিবেদন। এছাড়া রেডিও, দৈনিক পত্রিকা এমনকি স্মার্টফোনেও আমরা প্রতিদিনের আবহাওয়ার প্রতিবেদন দেখতে পাই। এই প্রতিবেদনে আবহাওয়ার যে বিষয়গুলোর কথা জানানো হয় তার মধ্যে রয়েছে,

- ☑ রোদ
- ☑ বৃষ্টি
- ☑ বায়ুর তাপমাত্রা
- ☑ বায়ুর আর্দ্রতা
- ☑ বায়ুপ্রবাহের দিক
- ☑ বায়ুচাপ ইত্যাদি।

এগুলোকে বলা হয় আবহাওয়ার উপাদান। এগুলোর বিভিন্ন মানের ভিত্তিতে আবহাওয়া কেমন হবে তা বোঝা যায়।

রোদ

পৃথিবীতে শক্তির প্রধান উৎস সূর্য। তাপ ও আলো আকারে এই শক্তি সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসে। একে সূর্যালোক বা রোদ এবং ইংরেজিতে ইন্সলেশন (insolation) বলা হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যালোক বিভিন্ন পরিমাণে পৃথিবীতে আসে। এটা নির্ভর করে সূর্য আকাশে কত সময়ব্যাপী থাকে এবং আকাশ কতটা পরিষ্কার তার ওপর। বলো তো বছরের কোন সময় (মাস অথবা ঋতু) আকাশ বেশি সময় ধরে পরিষ্কার ও নীল থাকে এবং কোন সময় মেঘলা থাকে?

সূর্য যদি বেশি সময় ধরে আকাশে অবস্থান করে তাহলে স্বাভাবিকভাবে সেই স্থানের পৃথিবীপৃষ্ঠ বেশি সূর্যালোক পাবে। কাজেই সূর্য আকাশে কত সময় ধরে অবস্থান করছে তার উপরেও সূর্যালোকের পরিমাণ নির্ভর করে। এখানে পৃথিবী পৃষ্ঠ বলতে পৃথিবীর মাটি, পানি এবং বাতাসকে বোঝানো হচ্ছে। আবার দিনের কম সময়ব্যাপী যদি সূর্য আকাশে থাকে তাহলে পৃথিবী পৃষ্ঠ কম সূর্যালোক পাবে। শীতকালে দেরিতে সূর্য ওঠে এবং তাড়াতাড়ি সূর্য অস্ত যায়। ফলে আকাশে সূর্যের অবস্থানকাল সংক্ষিপ্ত হয়। কম সময় ধরে সূর্যালোক পাওয়ার কারণে পৃথিবীর পৃষ্ঠ তুলনামূলকভাবে শীতল থাকে। তাহলে বলো তো বছরের কোন সময়ে সূর্য বেশি সময় ধরে আকাশে থাকে? তখন পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কেমন হবে?

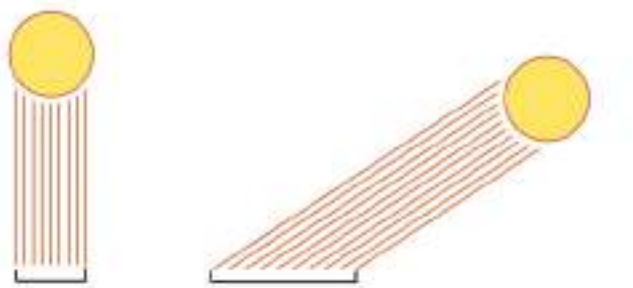

ছবি: গ্রীষ্ম এবং শীতকালে সূর্যের আলোক রশ্মি পড়ার কোণ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ গ্রীষ্মকালের তুলনায় শীতকালে একই পরিমাণ সূর্যালোক বেশি জায়গা জুড়ে পড়ছে

রোদ বেশি সময়ব্যাপী এবং তীব্র হলে সেই স্থানে বাষ্পীভবনের পরিমাণও বেড়ে যায়।

বায়ুর তাপমাত্রা

গ্রীষ্মকালে রোদে না গিয়ে ছায়ায় বা ঘরে থাকলেও গরম অনুভূত হয়। এর কারণ তখন আমাদের চারপাশে বায়ুর তাপমাত্রা বেশি থাকে। এই তাপমাত্রা কেমন হয় তা নির্ভর করে,

» **সূর্যের আলোর ভূমিতে পড়ার কোণের উপর :** সূর্যের আলো খাড়াভাবে পড়লে (অর্থাৎ ভূমির সাথে ৯০ ডিগ্রি বা তার কাছাকাছি কোণ হলে) সূর্যের আলো ও তাপের পরিমাণ বেশি হয় এবং ভূপৃষ্ঠ ও তার সংলগ্ন বায়ু বেশি উত্তপ্ত হয়। আবার শীতকালে সূর্যালোক ৯০ ডিগ্রি থেকে অনেক কম কোণে ভূপৃষ্ঠে পড়ার কারণে সূর্যালোকের তীব্রতা কমে যায়। ফলে বায়ুর তাপমাত্রা কমে যায় এবং ঠান্ডা অনুভূত হয়।

» **সূর্যালোকের উপস্থিতির সময়ের উপর :** তোমরা খেয়াল করে দেখো গ্রীষ্ম এবং শীতকালের মধ্যে কোন সময়ে সূর্য বেশি সময় আকাশে দেখা যায়। সূর্যালোক যত বেশি সময়ব্যাপী কোনো স্থানে উপস্থিত থাকবে, সেই স্থানের বায়ু তত বেশি গরম হবে।

» **বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ :** জলীয়বাষ্প বেশি তাপ ধারণ করতে পারে। এর ফলে কোনো স্থানের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি হলে সেখানে বেশি গরম অনুভূত হবে।

থার্মোমিটার (thermometer) দিয়ে বায়ুর তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়।

বৃষ্টি

আবহাওয়ার একটি অন্যতম উপাদান হলো বৃষ্টি। বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে বর্ষাকালে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। আকাশ থেকে বিভিন্ন আকারের পানির অসংখ্য ফোঁটা ঝরে পড়ে। এই পানি কোথা থেকে এসেছে?

এখন কয়েকটি ঘটনা দেখা যাক। চুলায় ভাত রান্না করার সময় অথবা পানি গরম করলে সেই পাত্র থেকে পানির বাষ্প উপরে উঠতে দেখা যায়। আবার ভেজা কাপড় দড়িতে বিশেষ করে রোদে মেলে দিলে তা শুকিয়ে যায়। এই পানি যায় কোথায়? এই পানি বাতাসের সাথে মিশে যায়। একইভাবে দিনের বেলা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ভূপৃষ্ঠ বা পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত মাটি, পানি এবং উদ্ভিদ থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে মিশে যায়। বাতাসে এই জলীয়বাষ্প কিন্তু অনির্দিষ্ট পরিমাণে মিশে থাকতে পারে না। যে কোনো স্থানের বাতাসে জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা সীমিত এবং তা নির্ভর করে ঐ স্থানের তাপমাত্রার উপর। এটিকে আমরা একটি পানি খাবার গ্লাসের সাথে তুলনা করতে পারি। ঐ গ্লাসের পানি ধারণক্ষমতা নির্দিষ্ট । তাই গ্লাসে ইচ্ছেমতো পানি ঢাললে গ্লাসের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পানি গ্লাস থেকে উপচে বাইরে পড়ে। পৃথিবীপৃষ্ঠে বাতাসের ক্ষেত্রে (পৃথিবীর বায়ুর এই স্তরকে বায়ুমণ্ডল বলা হয়) কোনো স্থানের বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ সেখানকার বায়ুর ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত হয়ে গেলে সেই অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তরল পানির ছোট ছোট কণায় রূপান্তরিত হয় এবং তা পুনরায় পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে । বৃষ্টি এই ফিরে আসা পানির অনেকগুলো রূপের একটি রূপ মাত্র । এক্ষেত্রে জলীয়বাষ্প ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠে গেলে তা ক্রমশ ঠান্ডা ও ঘনীভূত হয়ে প্রথমে মেঘ (যা অত্যন্ত ছোট তরল পানির কণা এমনকি বরফের কণা দিয়েও গঠিত হতে পারে) এবং তারপর বৃষ্টির পানির ফোঁটায় পরিণত হয়। পানির সূক্ষ্ম কণা যখন

ছবি: বৃষ্টিপাতের উৎপত্তি এবং এর পানির পরিবর্তন

একীভূত হয়ে আরো বড় পানির কণায় পরিণত হয় তখন তা আর বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকতে পারে না এবং বৃষ্টির পানির ফোঁটা আকারে ঝরে পড়ে। পরবর্তীকালে তা নদী, নালা, খাল, বিল ইত্যাদির মাধ্যমে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়। বৃষ্টিপাত পরিমাপের যন্ত্র হলো রেইন গজ (rain gauge)।

বায়ুচাপ

আমাদের চারপাশে যে বায়ু আছে তার উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একটা প্রভাব রয়েছে। ফলে তারও কিন্তু একটা ওজন রয়েছে এবং এই বায়ু যা কিছু স্পর্শ করে তার উপরেই চাপ প্রয়োগ করে। ভূপৃষ্ঠের উপরস্থ যে কোনো বস্তু বা স্থানের উপর বায়ুমণ্ডল একক ক্ষেত্রফলে যে চাপ প্রয়োগ করে সেটাই বায়ুচাপ। এই চাপ সবদিক দিয়ে প্রয়োগ হয়। যদি আমরা একটা পানির গ্লাস কানায় কানায় পানি দিয়ে পূর্ণ করি এবং তার মুখের উপর একটি শক্ত কাগজ বা কার্ডবোর্ড দিয়ে আটকিয়ে গ্লাসটি উল্টাই তবে দেখা যাবে পানিসহ গ্লাসটি উল্টে থাকা সত্ত্বেও পানি পড়ে যাচ্ছে না। বায়ু সবদিক থেকে চাপ দেয় বলেই এমন হয়।

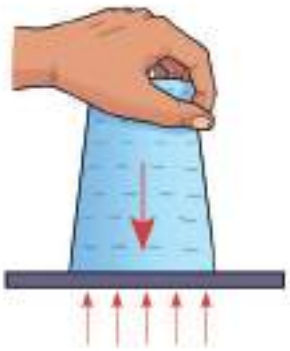

ছবি: বায়ুচাপের পরীক্ষা

আমরা পানিতে নেমে গভীরে ডুব দিলে শরীরের উপরে যেটুকু পানি থাকে তার চাপ অনুভব করি, কারণ পানি বাতাসের তুলনায় অনেক ভারি। বায়ুমণ্ডলও আমাদের উপর চাপ প্রয়োগ করছে যা আমরা সহজে বুঝতে পারি না। তবে অনেক উঁচু স্থানে গেলে বা বিমানে ভ্রমণ করার সময় বায়ুচাপের পরিবর্তন কিছুটা টের পাওয়া যায়। এই বায়ুচাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুচাপের একক হলো মিলিবার (Millibar)। বাতাসের গড় বায়ুচাপ হলো ১০১৩ মিলিবার। এর চেয়ে

বায়ুচাপ বেশি হলে তাকে উচ্চচাপ এবং কম হলে নিম্নচাপ বলা হয়। বায়ুচাপ কমে গেলে বা নিম্নচাপ হলে সেই নিম্নচাপ পূরণ করার জন্য আশেপাশের অঞ্চল থেকে বাতাস ছুটে আসে। (ছবি) সেই বাতাস পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। বাতাস উপরে উঠলে সেটি শীতল হয়ে পড়ে এবং বাতাসের জলীয় বাষ্প তরল জলকণায় রূপান্তরিত হয়ে বৃষ্টি হিসেবে নিচে নেমে আসে। সেজন্য বাতাসের নিম্নচাপ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নির্দেশ করে। বায়ুচাপ মাপার যন্ত্রের নাম ব্যারোমিটার (barometer)।

ছবি: বায়ুচাপ কমে গেলে আশেপাশের অঞ্চল থেকে ছুটে আসা বাতাস পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে উপরের দিকে উঠে যায়

বায়ুচাপ যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হলো,

» **সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার তারতম্য :** যত উপরে যাওয়া হবে, বায়ুচাপ তত কমবে।

» **বায়ুর উষ্ণতার তারতম্য :** বায়ুর উষ্ণতা বাড়লে বায়ুচাপ কমে এবং উষ্ণতা কমলে বায়ুচাপ বাড়ে। এই কারণে শীতকালে বাতাস তুলনামূলকভাবে শুষ্ক ও ভারি থাকে এবং উচ্চচাপ দেখা যায়।

» **বায়ুতে জলীয়বাষ্পের তারতম্য :** বায়ুর উষ্ণতা বাড়লে বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণও বেড়ে যায়। এর ফলে বায়ুচাপ কমে যায় ও ব্যারোমিটারে নিম্নচাপ দেখায় (১০১৩ মিলিবারের কম)। কারণ বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে বায়ু আর্দ্র হয়ে যায় যা শুষ্ক বায়ুর তুলনায় হালকা।

» **পৃথিবীর আবর্তন গতি :** পৃথিবী তার নিজ অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘোরে যাকে আবর্তন গতি বলা হয়। এর কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বায়ুচাপ কম হয়ে থাকে।

বায়ুপ্রবাহের দিক

বাতাস কোন দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস। যেমন, বাংলাদেশে শীতকালে উত্তর দিক থেকে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং বায়ুর তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। আবার গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু প্রবাহিত হয়। অধিক জলীয়বাষ্পের উপস্থিতির কারণে এই বায়ু প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বায়ুর নাম মৌসুমি বায়ু। বায়ুপ্রবাহের দিক বের করার যন্ত্রের নাম উইন্ডভেন (wind vane)।

ছবি: উইন্ডভেনের মাধ্যমে বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয়ের পরীক্ষা

বাতাসের আর্দ্রতা

বায়ুতে একক আয়তনে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতি হলো বায়ুর আর্দ্রতা। এই আর্দ্রতা পরিমাপের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন,

» প্রকৃত আর্দ্রতা : প্রকৃত আর্দ্রতা বলতে বোঝায় বাতাসের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের মধ্যে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণ, অর্থাৎ প্রতি কিউবিক মিটার বাতাসে কত গ্রাম জলীয়বাষ্প রয়েছে। বাতাসের তাপমাত্রার সাথে প্রকৃত আর্দ্রতার কোনো সম্পর্ক নেই।

» আপেক্ষিক আর্দ্রতা : একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন স্থানের বায়ু সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে তার তুলনায় শতকরা কত পরিমাণ আছে, তা-ই হলো আপেক্ষিক আর্দ্রতা। বাতাসের তাপমাত্রা যত বেশি হয় সেটি তত বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে। বাতাসের তাপমাত্রা যদি ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় তাহলে এক কিউবিক মিটার বাতাস সর্বোচ্চ ৩০ গ্রাম পানি ধারণ করতে পারে। আবার বাতাসের তাপমাত্রা যদি ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় তাহলে এক কিউবিক মিটার বাতাস সর্বোচ্চ ১০ গ্রাম পানি ধারণ করতে পারে। কাজেই যদি কোথাও তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় এবং বলা হয় সেখানে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০%, তাহলে বুঝতে হবে সেই স্থানের বাতাসে প্রতি কিউবিক মিটারে ৩০ গ্রাম জলীয়বাষ্প রয়েছে এবং সেখানে আর জলীয়বাষ্প যোগ হতে পারবে না। অন্যভাবে বলা যায় বাতাসে যখন প্রতি কিউবিক মিটারে ১০ গ্রাম পানি থাকে তখন বাতাসের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে সেখানে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০% কিন্তু বাতাসের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে সেটি মাত্র ৩৩%!

আর্দ্রতা বেশি হলে সেই স্থানে ভেজা বস্তু সহজে শুকানো যায় না। বলা যেতে পারে ঘরে বর্ষাকালে যখন বাতাসের আর্দ্রতা অনেক বেশি থাকে তখন একটি ১০ফুট x ১০ফুট x ১০ফুট ঘরের বাতাসে প্রায় এক লিটার পানি থাকে।

বাতাসের আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয় হাইগ্রোমিটার (hygrometer) এর মাধ্যমে।

৭.১.২ জলবায়ু

জলবায়ু হলো কোনো একটি এলাকার নির্দিষ্ট সময়ের গড় আবহাওয়া। কোনো একটি এলাকার জলবায়ু বুঝতে হলে কমপক্ষে ৩০ বছরের আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের তথ্য দরকার। তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত হচ্ছে জলবায়ু বিষয়ে জানার প্রধান দুটি উপাদান। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, আবহাওয়ার যে সকল উপাদান আছে তা একই সাথে জলবায়ুরও উপাদান (রোদ, বৃষ্টি, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ইত্যাদি)।

কোনো এলাকার জলবায়ু ব্যাখ্যা করার জন্য জলবায়ু বিজ্ঞানীরা যে তিনটি বিষয় বিবেচনা করে থাকেন তা হলো:

(১) সেই স্থানের গড় তাপমাত্রা কত?

(২) সেই স্থানের গড় বৃষ্টিপাত কত?

(৩) বিভিন্ন ঋতুতে সেখানে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন কতটা হয়?

সুতরাং জলবায়ু বলতে আমরা একটি এলাকার আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের কয়েক দশকের (৩০ বছর বা তার বেশি) পরিবর্তনের ধারা (pattern) বুঝে থাকি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং মানুষের সৃষ্টি করা কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়ে থাকে যা অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, কলকারখানা ও বিভিন্ন যানবাহন থেকে নির্গত গ্রিনহাউজ গ্যাস জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অনেকাংশে জড়িত। সেক্ষেত্রে যে সকল দেশে অধিক কলকারখানা এবং তেল গ্যাসচালিত যানবাহন রয়েছে সেসব দেশ অধিক পরিমাণে গ্রিনহাউজ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নির্গত করে যা জলবায়ুর পরিবর্তনে অধিক দায়ী।

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া (greenhouse effect)

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া এমন একটি প্রক্রিয়া যেটির কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হয়ে যায়। এই নামটি এসেছে শীতপ্রধান দেশে কৃষিকাজ করার জন্য ব্যবহৃত কাচ বা অন্য স্বচ্ছ বস্তু দিয়ে নির্মিত গ্রিনহাউস নামক ঘরের নাম থেকে। এই গ্রিনহাউস দিনের বেলা সূর্য থেকে যে তাপ ও আলো পায়, তা রাতের বেলায় একটু ভিন্নরূপে পুনরায় বিকিরণ করে, যে কারণে এ তাপ গ্রিনহাউসের বাইরে যেতে পারে না। যার ফলে গ্রিনহাউসের ভিতরের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রার তুলনায় বেশি থাকে। ঠিক একই প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের কিছু গ্যাস সূর্যের তাপে উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের পুনরায় বিকিরণ করা তাপ শোষণ করে বায়ুর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া নামে

ছবি: শীতের দেশে গ্রীনহাউজের ব্যবহার

ছবি: গ্রীনহাউজের ভেতরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি

পরিচিত। জলীয়বাষ্প, মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের কারণে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং এই গ্যাসগুলোকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলা হয়। গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণগুলো হলো:

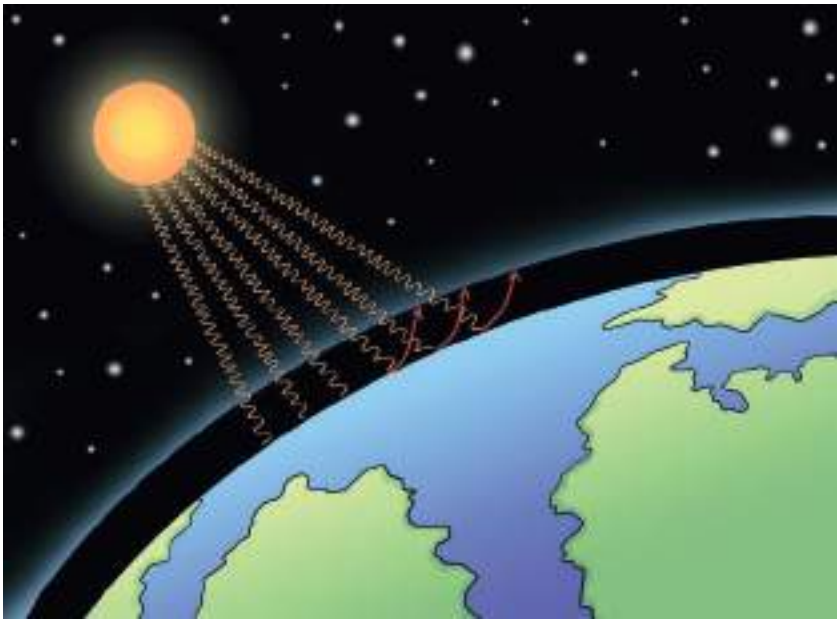

ছবি: গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া

- তেল, গ্যাস ও কয়লা পোড়ানোর ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রাস অক্সাইড উৎপন্ন হয়।
- বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাণী তথা জৈববস্তুর পচনের ফলে মিথেন বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। এই মিথেন গ্যাস গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় ৩০ গুণ বেশি শক্তিশালী।
- গবাদিপশু পালন বেড়ে গেলে মিথেন গ্যাসের পরিমাণও বাড়তে থাকে। গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গবাদিপশু তাদের খাদ্য হজমের কারণে প্রচুর মিথেন গ্যাস বাতাসে ছাড়ে।
- কৃষিজমিতে নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহার করলে সেখান থেকে নাইট্রাস অক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এই গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় অন্তত ১০ গুণ ক্ষতিকর এবং সর্বোচ্চ প্রায় ৩০০ গুণ বেশি ক্ষতি করতে সক্ষম।
- বন ধ্বংস এবং গাছ কাটার ফলে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করার জন্য গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ফলে বাতাসে মানবসৃষ্ট কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- কিছু যন্ত্রপাতি এবং দ্রব্যাদি (যেমন, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, ফোম, অ্যারোসল ইত্যাদি) থেকে এক ধরনের গ্যাস বের হয়, এদের ফ্লোরিনেটেড গ্যাস বলে। এই গ্যাসের গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় প্রায় ২৩,০০০ গুণ বেশি।

এই গ্যাসগুলোর পরিমাণ যত বাড়বে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া তত বেশি হবে। গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবীর দুই মেরুতে (উত্তর ও দক্ষিণ মেরু) জমে থাকা বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি অনেক ধরনের রোগজীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠায় বিভিন্ন রোগব্যাধির প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে।

অ্যাসিড বৃষ্টি

বৃষ্টির পানির সাথে অ্যাসিড বা অ্যাসিড জাতীয় উপাদান মিশ্রিত থাকলে সেটাকে অ্যাসিড বৃষ্টি বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বৃষ্টির পানির সাথে সালফিউরিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিড নামক তীব্র অ্যাসিড মিশ্রিত অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে ঝরে পড়ে। এমনকি তুষার, কুয়াশা, শিলা বৃষ্টির বরফ খণ্ড, ধূলিকণার সাথেও কঠিন বা তরল অবস্থায় অ্যাসিড জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো বৃষ্টির পানি, কুয়াশা, তুষার ইত্যাদিতে এই অ্যাসিড আসলো কী করে? বিভিন্ন মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে নির্গত সালফার ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড বাতাসে উপস্থিত জলীয়বাষ্প, অক্সিজেন এবং অন্যান্য রাসায়নিকের সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি হয়। তারপর তা পানি এবং অন্যান্য বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের সামান্য অংশ প্রাকৃতিক উৎস (যেমন, আগ্নেয়গিরি) থেকে সৃষ্টি হলেও অধিকাংশ আসে মানবসৃষ্ট বিভিন্ন উৎস থেকে । উৎসগুলো হলো:

- বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি; যেমন, তেল, গ্যাস বা কয়লা (বাতাসের ২/৩ অংশ সালফার ডাই অক্সাইড এবং ১/৪ অংশ নাইট্রোজেন অক্সাইড বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী জেনারেটর থেকে নির্গত হয়।)
- বিভিন্ন যানবাহন এবং ভারি যন্ত্রপাতি
- বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনকারী, তেল শোধনাগার এবং অন্যান্য কলকারখানা

বায়ু এসব উৎস থেকে নির্গত দূষণকারী গ্যাস ও অন্যান্য কণাকে অনেক দূর পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং সেখানে অ্যাসিড বৃষ্টি ঘটাতে পারে। এর ফলে দূষণকারী দেশ ছাড়াও দূরের অন্য দেশে অ্যাসিড বৃষ্টি হয়ে সেই এলাকার ক্ষতি হতে পারে। অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে যে সকল ক্ষতি হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হলো:

- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর জীবনধারণ কঠিন করে তোলে।
- উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের ক্ষতি হয়।
- মাটির গুণাগুণ (যা উদ্ভিদ এবং মাটির মধ্যে বসবাসকারী অন্যান্য অণুজীবের জন্য প্রয়োজন) নষ্ট হয়ে যায়।
- বিভিন্ন ধাতু নির্মিত যন্ত্রপাতি, অন্যান্য স্থাপনা এমনকি দালানকোঠারও ক্ষতি হয়ে থাকে। অ্যাসিড বৃষ্টির পানি ধাতু ও কংক্রিটের সাথে বিক্রিয়া করে সেগুলো ক্ষয় করতে থাকে।

ওজোনস্তর ক্ষয়

সূর্য থেকে যে অতিবেগুনি রশ্মি নির্গত হয় তা মানুষসহ জীবজগতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুমণ্ডলে ওজোন নামক এক ধরনের গ্যাসের একটি আবরণ থাকায় এই ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে না। বায়ুমণ্ডলের নিচের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তরে (স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার) এই ওজোন গ্যাসের আবরণটি রয়েছে যা ওজোনস্তর নামে পরিচিত। এই স্তর সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন জীবকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কিন্তু কিছু দূষণকারী উপাদানের উপস্থিতির কারণে এই স্তর ক্ষয়ে যাচ্ছে। যার ফলে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করে জীবজগতের ক্ষতি করছে। ওজোনস্তর ক্ষয়ের জন্য দায়ী দূষণকারী উপাদানগুলো হচ্ছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, হাইড্রো-ক্লোরো-ফ্লোরো -কার্বন ইত্যাদি। ওজোনস্তরের ক্ষয়ের ফলে নিম্নরূপ ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ করা যায়,

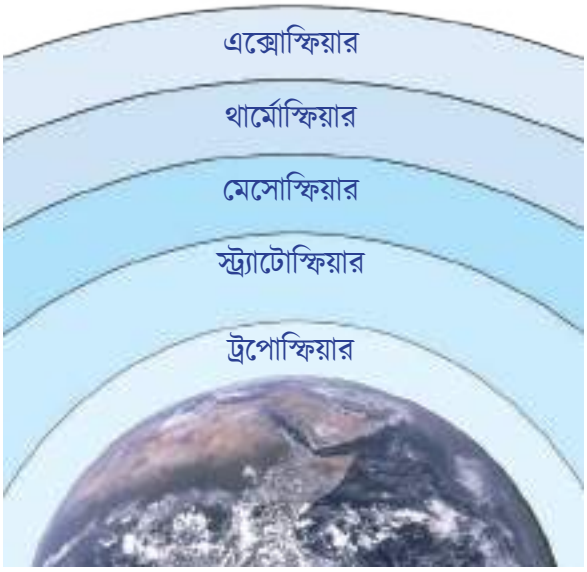

ছবি: বায়ুমণ্ডলের স্তর

- **মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব :** ওজোনস্তর ক্ষয়ের ফলে মানুষ ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির সরাসরি স্পর্শে আসে। ফলে তাদের মধ্যে নানানরকম শারীরিক সমস্যা যেমন, চর্মরোগ, ক্যান্সার, সূর্যের তাপে চামড়া পোড়ার মতো লাল হয়ে যাওয়া, চোখে ছানি পড়া, তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাওয়া, দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখা দেয়।
- **প্রাণীর উপর প্রভাব :** অতিবেগুনি রশ্মির সরাসরি স্পর্শে প্রাণীদের চোখ ও চামড়ার ক্যান্সার হয়ে থাকে।
- **উদ্ভিদের উপর প্রভাব :** শক্তিশালী অতিবেগুনি রশ্মি গাছের বৃদ্ধি কমিয়ে দিতে পারে, খাদ্য তৈরি (একে সালোকসংশ্লেষণ বলা হয়) এমনকি ফুল ফোটার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ফলে বনের গাছপালাগুলোকে এই ক্ষতিকর প্রভাব বহন করতে হয়।
- **জলজ ও সামুদ্রিক জীবের উপর প্রভাব :** অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী (যেগুলো প্ল্যাংকটন নামে পরিচিত) অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের খাদ্যের উৎস হলো এই প্ল্যাংকটন। এগুলো ধ্বংস হলে জলজ জীবও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

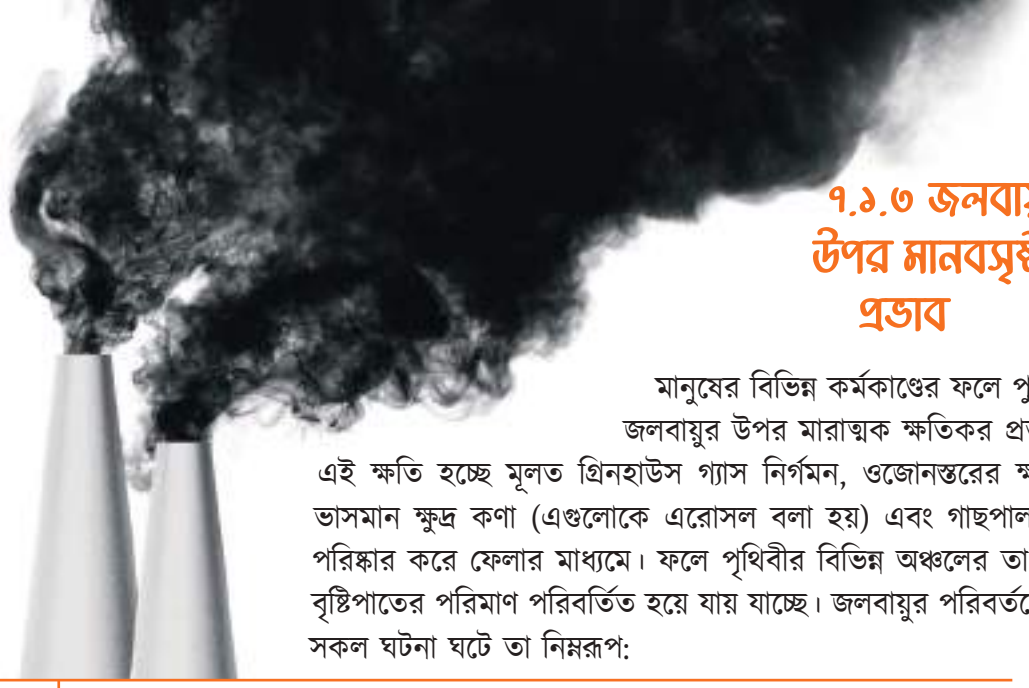

৭.১.৩ জলবায়ুর উপর মানবসৃষ্ট প্রভাব

মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে পুরো পৃথিবীর জলবায়ুর উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। এই ক্ষতি হচ্ছে মূলত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন, ওজোনস্তরের ক্ষয়, বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র কণা (এগুলোকে এরোসল বলা হয়) এবং গাছপালা কেটে বন পরিষ্কার করে ফেলার মাধ্যমে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে যায় যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে যে সকল ঘটনা ঘটে তা নিম্নরূপ:

- মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ভারী বৃষ্টি এবং শক্তিশালী ঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কিছু কিছু জায়গায় বন্যা হচ্ছে এবং পানির গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। আবার কিছুকিছু স্থানে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে।
- ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ইউরোপের দক্ষিণ এবং মধ্য অঞ্চলগুলোতে নিয়মিত গরম আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে, খরা হচ্ছে ও বনে আগুন ধরে যাচ্ছে।
- বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ এবং অনুন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের (যেমন: ঝড়, ভারি বৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদি) সম্মুখীন হচ্ছে।
- অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারায় পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

অনুশীলনী ?

১। উঁচু পাহাড়ের উপরে বায়ুচাপ কি বেশি হবে নাকি কম?

২। তোমার আশপাশের মানুষদের কিংবা কলকারখানার কোন কোন কর্মকাণ্ড বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া বাড়াতে কাজ করছে? লক্ষ করে দেখো।